পড়ে পাওয়া

(গল্পগ্রন্থ – নীলগঞ্জের ফালমন্ সাহেব)

কালবৈশাখীর সময়টা। আমাদের ছেলেবেলার কথা।

বিধু, সিধু, নিধু, তিনু, বাদল এবং আরো অনেকে দুপুরের বিকট গরমের পর নদীর ঘাটে নাইতে গিয়েছি। বেলা বেশি নেই।

বিধু আমাদের দলের মধ্যে বয়সে বড়। সে হঠাৎ কান খাড়া করে বললে—ঐ শোন—

আমরা কানখাড়া করে শুনবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু শুনতে বা বুঝতে না পেরে বললাম—কি রে—

বিধু আমাদের কথার উত্তর দিলে না। তখনো কানখাড়া করে রয়েছে।

হঠাৎ আবার সে বলে উঠলো—ঐ—ঐ শোন—

আমরাও এবার শুনতে পেয়েছি—দূর পশ্চিম-আকাশে ক্ষীণ গুড়-গুড় মেঘের আওয়াজ।

নিধু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে—ও কিছু না—

বিধু ধমক দিয়ে বলে উঠলো—কিছু না মানে? তুই সব বুঝিস কিনা। বোশেখ মাসে পশ্চিম দিকে ওরকম মেঘ ডাকার মানে তুই কিছু জানিস? ঝড় উঠবে। এখন জলে নামবো না। কালবৈশাখী।

আমরা সকলে ততক্ষণে বুঝতে পেরেছি ও কি বলছে। কালবোশেখীর ঝড় মানেই আম কুড়োনো। বাঁড়ুজ্যেদের মাঠের বাগানে চাঁপাতলীর আম এ অঞ্চলে বিখ্যাত। মিষ্টি কি! এই সময়ে পাকে। ঝড় উঠলে তার তলায় ভিড়ও তেমনি। যে আগে গিয়ে পৌঁছতে পারে, তারই জয়।

সবাই বললাম—তবে থাক।

কিন্তু তখনো রোদ গাছপালার মাথায় দিব্যি রয়েছে। আমাদের অনেকের মনের সন্দেহ এখনো দূর হয়নি। ঝড়-বৃষ্টির লক্ষণ তো কিছু দেখা যাচ্ছে না, তবে বহু দূরাগত ক্ষীণ মেঘের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ওরই ক্ষীণ সূত্র ধরে বোকার মত চাঁপাতলীর তলায় যাওয়া কি ঠিক হবে?

বিধু আমাদের সকল সংশয় দূর করে দিলে। যেমন সে চিরকাল আমাদের সকল সংশয় দূর করে এসেছে। সে জানিয়ে দিলে যে, সে নিজে এখুনি চাঁপাতলীর আমতলায় যাচ্ছে, যার ইচ্ছে হবে সে ওর সঙ্গে যেতে পারে।

এরপর আর আমাদের সন্দেহ রইল না। আমরা সবাই ওর সঙ্গে চললাম।

অল্পক্ষণ পরেই প্রমাণ হল ও আমাদের চেয়ে কত বিজ্ঞ। ভীষণ ঝড় উঠলো, কালো মেঘের রাশি উড়ে আসতে লাগলো পশ্চিম থেকে। বড় বড় গাছের মাথা ঝড়ের বেগে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়তে লাগলো, ধুলোতে চারিদিকে অন্ধকার হয়ে গেল, একটু পরেই ঠাণ্ডা হাওয়া বইল, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে পড়তে চড়চড় করে ভীষণ বাদলের বর্ষা নামলো।

বড় বড় আমবাগানের তলাগুলি ততক্ষণে ছেলেমেয়েতে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। আম ঝরছে শিলাবৃষ্টির মতো; প্রত্যেক ছেলের হাতে এক এক বোঝা আম। আমরাও যথেষ্ট আম কুড়ুলাম, আমের ভারে নুয়ে পড়লাম এক একজন। ভিজতে ভিজতে কেউ অন্য তলায় চলে গেল, কেউ বাড়ি চলে গেল আমের বোঝা নামিয়ে রেখে আসতে। আমি আর বাদল সন্ধ্যের অন্ধকারে নদীর ধারের পথ দিয়ে বাড়ি ফিরছি। পথে কেউ কোথাও নেই, ছোট বড় ডালপালা পড়ে পথ ঢেকে গিয়েছে; পাকা নোনাসুদ্ধ নোনাগাছের ডাল কোথা থেকে উড়ে এসে পড়েছে, কাঁটাওয়ালা সাঁইবাবলার ডালে পথ ভর্তি, কাঁটা ফুটবার ভয়ে আমরা ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে পথ চলছি আধ-অন্ধকারের মধ্যে।

এমন সময় বাদল কি একটা পায়ে বেধে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। আমায় বললে—দ্যাখ তো রে জিনিসটা কি?

আমি হাতে তুলে দেখলাম একটা ছোট টিনের বাক্স, চাবি বন্ধ। এ ধরনের টিনের বাক্সকে পাড়াগাঁ অঞ্চলে বলে 'ডবল টিনের ক্যাশ বাক্স'—টাকাকড়ি রাখে পাড়াগাঁয়ে, এ আমরা জানি।

বাদল হঠাৎ বড় উত্তেজিত হয়ে পড়লো। বললে— দেখি জিনিসটা?

—দ্যাখ তো, চিনিস?

—চিনি, ‘ডবল টিনের ক্যাশ বাক্স।

—টাকাকড়ি থাকে।

—তাও জানি।

—এখন কি করবি?

—সোনার গহনাও থাকতে পারে। ভারী দেখেছিস কেমন?

—তা তো থাকেই। টাকা গহনা আছেই এতে।

‘টিনের ক্যাশ বাক্স’ হাতে আমরা দু’জনে সেই অন্ধকার তেঁতুলতলায় বসে পড়লাম। দুজনে এখন কি করা যায় তাই ঠিক করতে হবে এখানে বসে। আম যে প্রিয় বস্তু, এত কষ্ট করে জল-ঝড় অগ্রাহ্য করে যা কুড়িয়ে এনেছি, তাও একপাশে অনাদৃত অবস্থায় পড়েই রইল থলেতে বা দড়ির বোনা গেঁজেতে।

বাদল বললে কেউ জানে না যে আমরা পেয়েছি—

—তা তো বটেই, কে জানবে আর!

—এখন কি করা যায় বল।

—বাক্স তো তালা-বন্ধ—

—এখুনি ইট দিয়ে ভাঙি যদি বলিস তো—ওঃ, না জানি কত কি আছে রে এর মধ্যে। তুই আর আমি দু’জনে নেবো, আর কেউ না—খুব সন্দেশ খাবো।

ঝড়ের ঝাপটা আবার এল। আমরা তেঁতুলগাছের গুঁড়িটার আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। তেঁতুলগাছে ভূত আছে সবাই জানে। কিন্তু ভূতের ভয় আমাদের মন থেকে চলে গিয়েছে। অন্যদিনে আমাদের দুজনের সাধ্য ছিল না এ সময় এ গাছতলায় বসে থাকি।

বাদল বললে—শীতে কেঁপে মরছি। কি করা যাবে বল। বাড়ি কিন্তু নিয়ে যাওয়া হবে না, তাহোলে সবাইকে ভাগ দিতে হবে, সবাই জেনে যাবে। কি করবি?

—আমার মাথায় কিছু আসছে না রে।

—ভাঙি তালা। ইট নিয়ে আসি, তুই থাক এখানে।

—না, তালা ভাঙিসনে। ভাঙলেই তো গেল। অন্যায় কাজ হয় তালা ভাঙলে, ভেবে দ্যাখ। কোনো গরিব লোকের হয়তো। আজ তার কি কষ্ট হচ্ছে, রাতে ঘুম হচ্ছে না— তাকে ফিরিয়ে দেবো বাক্সটা।

বাদল ভেবে বললে—ফেরত দিবি?

—দেবো ভাবছি।

—কি করে জানবি কার বাক্স?

—চল সে মতলব বার করতে হবে। অধর্ম করা হবে না।

এক মুহূর্তে দু'জনের মত বদলে গেল। দু'জনেই হঠাৎ ধার্মিক হয়ে উঠলাম। বাক্স দেওয়ার কথা মনে আসতেই আমাদের অদ্ভুত পরিবর্তন হোল। বাক্স নিয়ে জলঝড়ে ভিজে সন্ধ্যার পর অন্ধকারে বাড়ি চলে এলাম। বাদলদের বাড়ির বিচুলিগাদায় লুকিয়ে রাখা হল বাক্সটা।

তারপর আমাদের দলের এক গুপ্ত মিটিং বসলো বাদলদের ভাঙা নাটমন্দিরের কোণে। বর্ষার দিন— আকাশ মেঘে মেঘাচ্ছন্ন। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম। সেই কালবৈশাখীর ঝড়-বৃষ্টির পরই বাদলা নেমে গিয়েছে। একটা চাঁপাগাছের ফোটা চাঁপাফুল থেকে বর্ষার হাওয়ার সঙ্গে মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। ব্যাঙ ডাকছে নরহরি বোষ্টমের ডোবায়।

আমাদের দলের সর্দার বিধুর নির্দেশমতো এ মিটিং বসেছিল। বাক্স ফেরত দিতেই হবে—এ আমাদের প্রথম ও শেষ প্রস্তাব। মিটিং-এ প্রস্তাব পেশ করার আগেই মনে মনে আমরা সবাই সেটি মেনেই নিয়েছিলাম। বিধুকে জিজ্ঞেস করা হোল বাক্স ফেরত দেওয়া সম্বন্ধে আমরা সকলেই একমত, অতএব এখন উপায় ঠাওরাতে হবে বাক্সের মালিককে খুঁজে বার করবার। কারো মাথায় কিছু আসে না—এ নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা হল। যে কেউ এসে বলতে পারে বাক্স আমার, কি করে আমরা প্রকৃত মালিককে খুঁজে বার করবো? মস্ত বড় কথা— কোনো মীমাংসাই হয় না।

অবশেষে বিধু ভেবে ভেবে বললে—মতলব বার করিছি। ঘুড়ির মাপে কাগজ কেটে নিয়ে আয় দিকি।

বলেছি— বিধুর হুকুম অমান্য করার সাধ্য আমাদের নেই। দু-তিনখানা কাগজ ঐ মাপে কেটে ওর সামনে হাজির করা হোল।

বিধু বললে—লেখ—বাদল লিখুক, ওর হাতের লেখা ভালো।

বাদল বলল—কি লিখবো বলো—

—লেখ বড় বড় করে। বড় হাতের লেখার মতো, বুঝলি? আমি বলে দিচ্ছি—

—বল—

—আমরা এক বাক্স কুড়িয়ে পেয়েছি। যার বাক্স তিনি রায়বাড়িতে খোঁজ করুন। ইতি-বিধু সিধু নিধু তিনু।

আমি আর বাদল আপত্তি করে বললাম—বারে, আমরা কুড়িয়ে পেলাম, আর আমাদের নাম থাকবে না বুঝি? আমাদের ভালো নাম লেখো!

বিধু বললে— লিখে দাও। ভালোই তো। ভালো নাম সবারই লেখো।

তিনখানা কাগজ লিখে নদীর ধারের রাস্তায় ভিন্ন ভিন্ন গাছে বেলের আঠা দিয়ে মেরে দেওয়া হোল।

দু'তিন দিন কেটে গেল।

কেউ এল না।

তিন দিন পরে একজন কালোমতো রোগা লোক আমাদের চণ্ডীমণ্ডপের সামনে এসে দাঁড়ালো। আমি তখন সেখানে বসে পড়ছি। বললাম—কি চাও?

—বাবু, ইদিরভীষণ কার নাম?

—আমার নাম। কেন? কি চাই?

—একটা বাক্স আপনারা কুড়িয়ে পেয়েছেন?

আমার নামের বিকৃত উচ্চারণ করাতে আমি চটে গিয়েছি তখন। বিরক্তভাবে বললাম—কি রকম বাক্স?

—কাঠের বাক্স?

—না। যাও।

—বাবু, কাঠের নয়, টিনের বাক্স।

—কি রংয়ের টিন?

—কালো।

—না, যাও।

—বাবু দাঁড়ান, বলছি। মোর ঠিক মনে হচ্ছে না— এই রাঙা মতো—

—না, তুমি যাও।

লোকটা অপ্রতিভভাবে চলে গেল। বিধুকে খবরটা দিতে সে বললে- ওর নয় রে, লোভে পড়ে এসেছে। ওর মতো কত লোক আসবে!

আবার তিন চার দিন কেটে গেল।

বিধুর কাছে একজন লোক এল তারপরে। তারও বর্ণনা মিললো না; বিধু তাকে বিদায় দিলে পত্রপাঠ। যাবার সময় সে নাকি শাসিয়ে গেল, চৌকিদারকে বলবে, দেখে নেবে আমাদের ইত্যাদি। বিধু তাচ্ছিল্যের সুরে বললে—যাও যাও, যা পারো করো গিয়ে। বাক্স আমরা কুড়িয়ে পাইনি। যাও।

আর কোনো লোক আসে না।

বর্ষা পড়ে গেল ভীষণ।

সেবার আমাদের নদীতে এল বন্যা।

বড় বড় গাছ ভেসে যেতে দেখা গেল নদীর স্রোতে। দু'একটা গরুও আমরা দেখলাম ভেসে যেতে। অম্বরপুর চরের কাপালীরা নিরাশ্রয় হয়ে গেল। নদীর চরে ওদের ছোট ছোট ঘরবাড়ি সেবারেও দেখে এসেছি— কি চমৎকার পটলের আবাদ, কুমড়োর ক্ষেত, লাউকুমড়োর মাচা ওদের চরে! দু'পয়সা আয়ও পেতো তরকারি বেচে। কোথায় রইলো তাদের পটল কুমড়োর আবাদ, কোথায় গেল তাদের বাড়িঘর। আমাদের ঘাটের সামনে দিয়ে কত খড়ের চালাঘর ভেসে যেতে দেখলাম। সবাই বলতে লাগলো অম্বরপুর চরের কাপালীরা সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে।

একদিন বিকেলে আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে একটা লোক এল। বাবা বসে হাত-বাক্স সামনে নিয়ে জমাজমির হিসেব দেখছেন। গ্রামের ভাদুই কুমোর কুয়ো কাটানোর মজুরি চাইতে এসেছে। আরো দু'একজন প্রজাপত্তর এসেছে খাজনা দিতে। আমরা দু'ভাই বাবার কড়া শাসনে বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছি। এমন সময়ে একটা লোক এসে বললে— দণ্ডবৎ হই, ঠাকুরমশায়।

বাবা বললেন—এসো। কল্যাণ হোক। কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

—আজ্ঞে অম্বরপুর থেকে। আমরা কাপালী।

—বোসো। কি মনে করে? তামাক খাও। সাজো।

লোকটা তামাক সেজে খেতে লাগলো। সে এসেছে এ গাঁয়ে চাকরির খোঁজে। বন্যায় নিরাশ্রয় হয়ে, নির্বিষখোলার গোয়ালাদের চালাঘরে সপরিবারে আশ্রয় নিয়েছে। এই বর্ষায় না আছে কাপড়, না আছে ভাত। দু'আড়ি ধান ধার দিয়েছিল গোয়ালারা দয়া করে, সে-ও এবার ফুরিয়ে এল। চাকরি না করলে স্ত্রী-পুত্র না খেয়ে মরবে।

বাবা বললেন— আজ এখানে দুটি ডাল-ভাত খেও।

লোকটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—তা খাবো। খাচ্ছিই তো আপনাদের। দুরবস্থা যখন শুরু হয় ঠাকুরমশাই— এই গত জষ্টি মাসে নির্বিষখোলার হাট থেকে পটল বেচে ফিরচি, ছোট মেয়েটার বিয়ে দেবো বলে গহনা গড়িয়ে আনছিলাম। প্রায় আড়াইশো টাকার গহনা আর পটল-বেচা নগদ টাকা পঞ্চাশটি—একটা টিনের বাক্সের ভেতর ছিল। সেটা যে হাটের থেকে ফিরবার পথে গরুরগাড়ি থেকে কোথায় পড়ে গেল, তার আর খোঁজই হল না। সেই হল শুরু— আর তারপর এল এই বন্যে—

বাবা বললেন—বলো কি? অতগুলো টাকা-গহনা হারালে?

—অদেষ্ট, একেই বলে বাবু অদেষ্ট। আজ সেগুলো হাতে থাকলে—

আমি কান খাড়া করে শুনছিলাম, বলে উঠলাম—কি রংয়ের বাক্স ?

—সবুজ টিনের।

বাবা আমাদের বাক্সের ব্যাপার কিছুই জানেন না। আমায় ধমক দিলেন—তুমি পড়ো না, তোমার সে খোঁজে কি দরকার? কিন্তু আমি ততক্ষণে বইপত্তর ফেলে উঠে পড়েছি। একেবারে একছুটে বিধুর বাড়ি গিয়ে হাজির। বিধু আমার কথা শুনে বললে—দাঁড়া, সিধু আর তিনুকেও নিয়ে আসি। ওরা সাক্ষী থাকবে কিনা?

বিধুর খুব বুদ্ধি আমাদের মধ্যে। ও বড় হলে উকিল হবে, সবাই বলতো।

আধঘণ্টার মধ্যে আমাদের চণ্ডীমণ্ডপের সামনে বেশ একটি ছোটখাটো ভিড় জমে গেল। বাক্স ফেরত পেয়ে সে লোকটা যেন কেমন হকচকিয়ে গেল। চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। কেবল আমাদের মুখের দিকে চায় আর বলে—ঠাকুরমশাই, আপনারা মানুষ না দেবতা? গরিবের ওপর এত দয়া আপনাদের?

বিধু অত সহজে ভুলবার পাত্র নয়। সে বললে—দেখে নাও মাল সব ঠিক আছে কিনা, আর এই কাকাবাবুর সামনে আমাদের একটা রসিদ লিখে দাও, বুঝলে? কাকাবাবু আপনি একটু কাগজ দিন না ওকে—লিখতে জানো তো?

না, ও উকিলই হবে বটে।

আমার বাবা এমন অবাক হয়ে গেলেন ব্যাপার দেখে যে তাঁর মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুলো না।